Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পদ্মানদীর মাঝি ও তিতাস একটি নদীর নাম : প্রান্তিক জীবনের দুই ভুবন

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hosne Ara
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.4
Pages	৬৯-৭৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পদ্মানদীর মাঝি ও *তিতাস একটি নদীর নাম* : প্রান্তিক জীবনের দুই ভু

Check for updates

হোসনে আরা*

জল ও জীবনের অন্বয় নদীবহুল বাংলার আবহমান চরিত্র। নদী-নির্ভর মানুষের জীবন অনিবার্যভাবেই উপন্যাস-সাহিত্যের বিরাট ক্যানভাসে এসেছে বহু মাত্রায়। ভূমি-কেন্দ্রিকতায় অনেকে নদীকে নেপথ্যে রেখেছেন, কেউ কেউ নদীর অনুষঙ্গে ঘটনাস্রোত প্রবাহিত করেছেন, আবার কেউ নদীকেই করেছেন উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬)। আবার একটিমাত্র মৌলিক উপন্যাস *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) বিখ্যাত করেছে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণকে। নদীকেন্দ্রিক হলেও দু-দশকের ব্যবধানে প্রকাশিত এ উপন্যাসদ্বয়ে বিষয়, জীবন-উপলব্ধি এবং জীবন-দৃষ্টিতে পার্থক্য নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান। পদ্মা ও তিতাস-তীরবর্তী জনপদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবন উপন্যাসদুটিতে এক ধরনের সাযুজ্য আনলেও উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় ঔপন্যাসিকদ্বয়ের স্বতন্ত্র মানসপ্রবণতা এতে প্রকীর্ণ রয়েছে।

১.১

'প্রান্তিক' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রান্তবাসী, প্রান্ত-সম্বন্ধীয় অথবা পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত দুই শ্রেণির প্রান্তে বা সীমায় অবস্থিত। পদ্মা ও তিতাস-তীরবর্তী যে জনজীবন আলোচ্য উপন্যাসদ্বয়ে প্রতিপাদ্য, তাদের অবস্থান শ্রেণিসীমার একান্ত প্রান্তে — একটু আঘাত কিংবা বিচ্যুতিতেই আমূল পরিবর্তন ঘটে তাদের জীবনে — ছিটকে পড়ে তারা স্বশ্রেণি, স্বসমাজ কিংবা স্ব-অবস্থান থেকে। আশ্বিনের এক প্রবল ঝড় আমিনুদ্দিকে করে ময়নাদ্বীপ প্রবাসী, চুরির সামান্য অপবাদে কুবেরকে তার পরিবার ত্যাগ করে গ্রামছাড়া হতে হয়, নদীর বুকে নতুনের প্রত্যাশা নিয়ে জেগে ওঠা ধবল চর বিনষ্ট করে গোকর্ণঘাট গ্রামনিবাসী মালো সমাজের বেঁচে থাকার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ; ব্যাপক বিপর্যয়, অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ধ্বংস হয় তাদের গোষ্ঠীজীবন।

১.২

ব-দ্বীপীয় বাংলাদেশ ভূখণ্ডে জমিনে ও জলে জীবন ও জীবিকার বিচিত্র বিকাশ কালের নানা আবর্তে বহুস্তরী রূপ লাভ করেছে। যখন ভূমি বিশ্রুতভাবে উর্বর এবং জল মৎস্যসম্পদে পূর্ণ তখন সেইসব স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রেণি বা বর্গের তলায় বা শেষসীমায় যাদের অবস্থান তাদের জীবনের বিশদপাঠ এবং

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও সময়ের বিশ্লেষণে ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা তৈরি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ইতিহাসকে সভ্যতার মহাসড়কে দাঁড়িয়ে নয়, তল থেকে দেখতে হবে— এই তাগিদ থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা শুরু হয়েছে। যেহেতু ইতিহাসচর্চার ভিত বদলে গেছে, তাই শিল্প-সাহিত্যের বিবেচনায় ভিন্ন পথ অবলম্বনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নদীর কারণেই বাংলার ভূগোল জল দিয়ে সীমায়িত। আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এদেশের রূপ ও দেশবাসীর জীবন বিশেষভাবে পরিস্ফুট। 'মাছে ভাতে বাঙালি' — এ প্রবচনে ভাত বা ধানের আগে মাছের কথা উচ্চারিত হয়েছে। এ প্রবচন মাছের উপর নদীমাতৃক দেশের মানুষের নির্ভরতা এবং তার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে। জলধারা ভূমির চেয়ে বেশি রূপান্তরশীল। এদেশে নদী দ্রুত গতিপথ পাল্টায় এবং নদীর মৃত্যুও অসম্ভব ঘটনা নয়। অপরপক্ষে জমি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। যদিও নদী ভাঙাগড়ার খেলায় স্থলের ভূগোল পাল্টায় তবু নদীতীরবর্তী নয় এমন ভূখণ্ডের স্থায়িত্বের সূত্রে জল ও জমিনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায়। জল ও জমিনের বহুমাত্রিক তুল্যমূল্য বিচারেই সমাজ-কাঠামোর চেহারা সৃষ্টি হয়েছে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এবং জল ও স্থলের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ভূগোলের বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে পাঠ না করলে মানব ইতিহাস বিশদ বয়ানে প্রকাশ পায় না । আলোচ্য পাঠে সে চেষ্টাই করা হয়েছে।

২.১

নদীপ্রধান বাংলার ভূগোলের দিকে তাকালে দেখা যায়, নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্গের মানুষ পরিত্যক্ত ভূমিতে অবস্থান করছে। উচ্চকোটি বা শাসক গোষ্ঠী তাদের কোণঠাসা করে রেখেছে। মানব ইতিহাসের ভয়ংকর চালিয়াতির খেলায় বর্ণের ও বর্গের হিসেবে সবচেয়ে নিচের স্তরে সীমাবদ্ধ প্রান্তিক মানুষের জীবন, তাই 'গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া'-উচ্চারণ করে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক অন্বিষ্ট জীবনের প্রান্তিকতাকে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। কেতুপুর নামক গ্রামের অভ্যন্তরে জেলেদের ব্রাত্য জীবনের স্থান নেই — তাদের সযত্ন স্পর্শ বাঁচিয়ে গ্রামজীবন বাহিত হয়। বিস্তীর্ণ নদীবক্ষে যারা অসীম সাহসী, অজেয়; সমতল ভূমিতে তারা অস্পৃশ্য, অনাহূত, অবহেলিত। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে ভূমির গুরুত্ব বিচার বিশেষ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। নদীতীরবর্তী সমতল প্রভূতভাবে উর্বর, তা থেকে প্রচুর পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। তাই ফসলি জমিনে নিম্নবর্গের অধিকার নেই। অপরপক্ষে নদীপারের উচ্চভূমিতে ফসল ফলে না। এই পারেই জেলেদের আটকে রাখা হয়েছে। উপন্যাসে লেখক স্বচ্ছ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন — "সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না।" (মানিক, ১৯৯৫ : ৩২৯) দারিদ্র্যপীড়িত ধূলি-কাদামাখা একটি কুগ্রহে বন্দি পদ্মাপারের জেলেরা। জাগতিক কোনো সূত্রে তাদের মুক্তি নেই, অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্সও তাদের নিষ্কৃতি দেয় নি। উপন্যাসের পরিধির মধ্যে লেখকের কণ্ঠস্বর তাই শ্লেষাত্মক উক্তিতে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে — "ঈশ্বর থাকেন ওইখানে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।" (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৩০)

তিতাস পারের মালোরা অবশ্য তাদের নিজস্ব ভূমি গোকর্ণঘাট গ্রামেই বাস করে কিন্তু তাদের গ্রামের পাশেই তেলি পাড়া, কায়স্থ পাড়া — অর্থাৎ ভদ্রশ্রেণিগোষ্ঠী। অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপস্থাপনায় আপাত লক্ষ্যে বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায় — মনে হয়, মালোরাই বুঝি ভদ্রশ্রেণির সংস্পর্শ বাঁচিয়ে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র আবাস গড়েছে, কিন্তু গভীর অনুসন্ধিৎসায় প্রকৃত সত্যের উন্মোচনে পদ্মাপারের ভৌগোলিক স্থানচিত্রের সাদৃশ্য আভাসিত হয় অর্থাৎ পদ্মা ও তিতাস উভয় নদী-তীরবর্তী জেলেরাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক, বিচ্ছিন্ন — প্রান্তিক জীবনের অধিকারী; কেবল ঔপন্যাসিকদ্বয়ের বর্ণনা, উপস্থাপন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় তা পৃথক পৃথক ব্যঞ্জনায় চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তুনিষ্ঠ বা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে যেখানে পদ্মা-তীরবর্তী মাঝিদের জীবনকে অবলম্বন করেছেন, সেখানে অদ্বৈত মল্লবর্মণের অভিজ্ঞতালব্ধ উপন্যাসের ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মালো বংশোদ্ভূত এ সাহিত্যিক নিজ সম্প্রদায়ের জীবন রচনায় প্রবল মমত্ববোধে জারিত, স্বজাতির সংস্কৃতি গৌরবে উদ্ভাসিত এবং জীবনদৃষ্টিতে একান্তভাবেই নেতিবাচকতা বিরুদ্ধপন্থী; জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা, হীনতা, দুঃখ-যন্ত্রণার স্পর্শ সযত্ন পরিচর্যায় প্রত্যাহার করে শাশ্বত, সমুজ্জ্বল তৃপ্ত জীবনের আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁর বর্ণনাতেও দারিদ্র্য আছে, কিন্তু সে দারিদ্র্য যন্ত্রণাপীড়িত বা বিক্ষুব্ধ করে না পাঠকমনকে বরং এক নির্বিকার ঔদাসীন্যে আচ্ছন্ন করে, গভীর এক ভাবে নিমজ্জিত করে।

২.২

নদী কিংবা সমুদ্র-তীরবর্তী জেলেজীবনকে উপজীব্য করে বিশ্বসাহিত্যে একাধিক উপন্যাস পাওয়া যায়। রাশিয়ার লেখক ভিলিস লাৎসিম-এর *জেলের ছেলে (১৯৩৪)*, *সাগর পারের গ্রামখানি (১৯৫৩)*, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী (১৯৫২)*, মালয়ালম ভাষায় ঔপন্যাসিক তাকষি শিবশঙ্কর পিল্লাই-এর লেখা *চিংড়ি (১৯৫৬)*, সমরেশ বসুর *গঙ্গা (১৯৫৭)* প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দেশ কিংবা ভাষার ভিন্নতায় উপন্যাসের পটভূমি কিংবা চরিত্র বা জীবন-কাঠামোয় ভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু জেলেজীবন নিয়ে লেখা প্রতিটি উপন্যাসেই — সে যে দেশের, যে কালের, যে দৃষ্টিভঙ্গিরই হোক না কেন — অনিবার্য হয়ে এসেছে জেলেদের অসহায়তার কথা, তাদের শোষণ-বঞ্চনার কথা, তাদের প্রাণান্তকর জীবন-সংগ্রাম, তাদের অভাব-নিপীড়নের মর্মস্পর্শী কাহিনী। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী* উপন্যাসের বুড়ো জেলে সান্তিয়াগো অপরাজেয় জীবন বা অজেয় মানবচরিত্রের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে; *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে দুর্দশার চাইতে মালো জীবনের মহত্ত্ব বা মাধুর্যকে তীব্রতা দেওয়া হয়েছে; *পদ্মানদীর মাঝিতে* জেলেদের দুর্দশার চিত্রের সমান্তরালে কুবের-কপিলার প্রণয় এবং হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপের উপাখ্যান প্রাধান্য বিস্তার করেছে তবুও প্রতিটি উপন্যাসে বর্ণিত জীবন-কথার অবগাহনে জেলেদের প্রান্তিকতার, তাদের শ্রেণি-চরিত্রের সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে যে জেলে জীবনের কাঠামো বা ফ্রেম পাওয়া যায়, তাতে ঔপন্যাসিকের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মনোভাব সুস্পষ্ট। এ সমাজের শ্রেণি-বৈষম্য এবং

শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব এসেছে উপন্যাসের প্রথমাংশেই। জাল ও নৌকার মালিক ধনঞ্জয় ও তার নৌকায় খাটা কুবের ও গণেশের শ্রেণিগত বিভাজন স্পষ্ট — যদিও তারা সকলেই জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত। লেখকের বর্ণনায় —

> ঐ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাতে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা ও জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে (মানিক, ১৯৯৫ : ৩২৫)

জাল ও নৌকার মালিকানার সুবাদে কুবের ও গণেশকে ঠকানোও সে কর্তব্য বলেই গণ্য করে আর সব কিছু জেনে বুঝেও নীরবে কুবেরকে তা সহ্য করতে হয়, ধনঞ্জয়ের প্রতারণায় সন্দেহ প্রকাশ করলেও পরক্ষণেই নরম গলায় তাকে বলতে শোনা যায়, "মিছা কওনের মানুষ তুমি না।" (মানিক, ১৯৯৫ : ৩২৯) ঔপন্যাসিক কুবের-গণেশের শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণ করেছেন এভাবে —

> গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩২৯)

আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিবেচনায় জেলেদের অবস্থান শনাক্ত করা কঠিন নয়। এখানে ভূমির মালিক জমিদার। জমিদারকে ঘিরে রয়েছে নায়েব, সর্দার, পাইক-পেয়াদা, মোড়ল, দালাল এরকম অনেক স্তরের মানুষ। তারপর রয়েছে বড় নৌকা ও বড় জালের মালিক, ছোট নৌকা ও ছোট জালের মালিক। এই ছোট মালিকের ওপর নির্ভর করে প্রান্তিক জেলেরা। যাদের নৌকা ও জাল কোনোটাই নেই, তাদের কোনো বিনিয়োগ নেই। তারা অন্যের বিনিয়োগে শ্রম দেয় এবং বলা যায় মৌলিক চাহিদার প্রথমটি মিটিয়ে জীবন বাঁচিয়ে রাখে মাত্র। প্রবাদে বলা হয়েছে, 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়।' এই প্রবাদ যে প্রান্তিকতার জানান দিয়েছে কুবের ও গণেশ সেই স্তরে অবস্থান করছে। অপরদিকে রয়েছে অর্থনীতির জটিল চাল। মাছের দর কখনোই এমন বেড়ে যায় না যাতে এই প্রান্তিক ইলিশ জেলেরা হঠাৎ অনেক টাকার মালিক হয়ে গিয়ে নিজের অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। চাহিদা ও যোগানের হিসাবটা নিয়ন্ত্রণ করছে মৎস্যবাজার পুঁজি। একে আমরা 'ইলিশ পুঁজি' বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কেননা প্রচুর পরিমাণ ইলিশের বেচাকেনার ওপর অর্থনীতির বিশেষ নির্ভরশীলতা রয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরাট যজ্ঞ পদ্মার ইলিশের সঙ্গে সম্পর্কিত। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্রিটিশ শোষণ প্রক্রিয়াকে একসময় ত্বরান্বিত করেছিল। এই রেল লাইন ইলিশ সংগ্রহস্থান নদীপার পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে — এ খবর ঔপন্যাসিক আমাদের জানিয়েছেন অর্থাৎ ইলিশ যে কলকাতার বাজার ও জনজীবনে পৌঁছে যাচ্ছে রেলের কল্যাণে কিন্তু তার সংগ্রহকারীরা থাকছে উপেক্ষিত। মেজো জমিদার অনন্ত তালুকদার, হোসেন মিয়া থেকে শুরু করে অখিল সাহা, কেদারনাথ, মুহুরী শীতল, ধনঞ্জয় এরা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে শোষক চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। জমিদার-নন্দন মেজোকর্তা জেলেদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলনের মহৎ উদ্দেশ্যে ব্রতী হলেও জেলেপাড়ার কেউ তাকে বিশ্বাস করে না; উপরন্তু জেলে-নারীদের গায়ে লাগে কলঙ্কের তিলক। বস্তুত

উচ্চশ্রেণির বঞ্চনা ও প্রতারণার জাল জালিকায় বন্দি, জীবনের মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত এই জেলেরা নিজেদের মধ্যে শুভবোধজাগানিয়া মূল্যবোধ সচল রেখে সমাজ গড়ে তুলতে পারে নি। জীবনের রূঢ় বাস্তবতার কশাঘাতে শীর্ণ এ মানুষগুলো বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় ম্রিয়মাণ— কারো প্রতিই তাদের কোন বিশ্বাস নেই। স্বশ্রেণির ধনঞ্জয়, সিধুর প্রতি কুবেরের যতখানি অবিশ্বাস, ততখানিই সন্দেহ স্বশ্রেণি থেকে ধনিক শ্রেণিতে উন্নীত হোসেন মিয়ার প্রতি। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা মাধুর্যে বিষয়টি স্পষ্টতর হয় —

> বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের। ... ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। মাঝে মাঝে এখনো সে জেলে পাড়ায় যাতায়াত করে, ভাঙা কুটিরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাইয়ে বসিয়া দা-কাটা কড়া তামাক টানে। সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই সব অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালবাসা আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে যেন টানিয়া নিচে নামাইয়া আনে। না, মনে মনে ইহা বিশ্বাস করে না জেলেপাড়ার কেহই; জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একেবারে মিলন-সীমান্তে তাহারা বাস করে, মিত্র তাহাদের কেহ নাই। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৩৬)

প্রান্তিক মানুষের জীবন অবশ্য হোসেন মিয়াদের মত চরিত্রের আবির্ভাবে আরও বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। হোসেন ঔপনিবেশিক পরবর্তী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নব্য প্রতিনিধি। সমালোচক গুণময় মান্না হোসেন মিয়াকে 'বুর্জোয়া মানি মার্কেটের ভাব-প্রতিরূপ' হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (গুণময়, ১৩৯৫) সুমিতা চক্রবর্তী হোসেনকে বলেছেন 'নির্ভুল ক্যাপিটালিস্ট' (সৈয়দ, ২০০৮ : ৫৪৪)। হোসেন জেলে বা কৃষকদের কেউ নয়। তার সঙ্গে জমিদারের কোন সম্পর্ক নেই। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে একটি দ্বীপ সে নিলামে কিনে নিয়েছে। দ্বীপের নাম ময়না দ্বীপ। দ্বীপটিতে আজও মানুষের জীবন শুরু হয়নি। এরকম একটি কুমারী দ্বীপ মানুষের বসবাস উপযোগী করতে হলে মানুষকে আবার সভ্যতার ঊষালগ্নের চাষায় পরিণত হতে হয়। হোসেন তাই নানা পাকচক্রে ফেলে জেলে ও অন্যান্য প্রান্তিক মানুষকে সেই শ্বাপদসংকুল ময়না দ্বীপে নিয়ে যায়। মানুষকে সে যন্ত্রপাতি দেয় , খাবার দেয় এবং যে যা ফসল ফলাবে সবই সে পাবে, এ-ই তার শর্ত। এ কারণেই তাকে সামন্তবাদী নয়, পুঁজিবাদী বলে অভিহিত করা সংগত বোধ হয়। প্রান্তিক অবস্থানের জেলেদের হোসেন দ্রুত খসিয়ে আনে তাদের পূর্বপুরুষের জীবিকা থেকে। জেলেদের জীবনে সুখ না থাকুক, দুঃখ সয়ে-যাওয়া একটি স্বস্তি ছিল, পূর্বপুরুষের জীবিকার ধারাবাহিকতার মধ্যে যে জীবন সে যাপন করছিল তাতে একটা স্বাচ্ছন্দ্য ছিল; কিন্তু হোসেন তাদেরকে সেই জীবন থেকে উৎখাত করেছে তার নিজস্ব প্রয়োজনে।

যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বেশি অর্থ উপার্জিত হয় তা মাদকের চোরাকারবার বা স্মাগলিং। হোসেন ইংরেজের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে আফিমের ব্যবসা করে। এ ব্যবসায় জেল-জরিমানার যে ঝুঁকি তার সঙ্গে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কুবেরসহ আরও অনেকের জীবনযুক্ত রেখেছে হোসেন। জমিদারের চেয়েও শক্তিশালী হোসেন। নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার হাতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। হোসেন খুচরা ব্যবসায়ী নয়, মজুতদারি ও পাইকারি ব্যবসার মধ্য দিয়ে সে বিপুল অঙ্কের টাকা

অর্জন করেছে। জমিদার পড়ন্ত আর হোসেন নব্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অগ্রভাগে অবস্থান করছে। আর এ দুইয়ের মাঝে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে কুবেরের মতো প্রান্তিক শ্রেণির মানুষেরা।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসেও শ্রেণি-বিভাজন আছে, তবে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব কিংবা শোষিত জনমানুষের হাহাকার ততটা তীব্রতা পায়নি। ঔপন্যাসিকের ইতিবাচক মনোভঙ্গি শ্রেণি-বৈষম্যকে উল্লেখ করেছে মাত্র, শোষকের রুদ্র প্রতাপ কিংবা শোষিতের দুঃসহ দহন, নিপীড়িতের অসহায় ক্রন্দন কোনটি প্রধান হয়ে ওঠে নি। অবধারিতভাবেই প্রান্তিক জীবনের অনুষঙ্গে মানুষের অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য, বঞ্চনা কিংবা অবদমনের ইতিহাস উল্লেখিত হয়েছে — তবে তা অনেকটাই নির্মোহ দৃষ্টিতে। শিক্ষিত কিংবা উচ্চশ্রেণির প্রতি সন্দেহ কিংবা অবিশ্বাসের ইঙ্গিত এ উপন্যাসেও পাওয়া যায় কিন্তু পরক্ষণেই ঔপন্যাসিকের ইতিবাচক মনোভঙ্গির স্পর্শে এ সন্দেহ বাষ্পীভূত হতেও ক্ষণমাত্র দেরি হয় না। ভৈরবের মালো সমাজে রেল কোম্পানির বাবুরা শিক্ষিত হওয়ার শ্লোগান তুললে প্রবীণ মালো তিলকচাঁদ সন্দেহ পোষণ করে — "তারা মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়া লোকের উপর" (অদ্বৈত, ২০০০ : ৪১৭) কিন্তু নতুন যুগের মালো সমাজের প্রতিনিধি কিশোর এ আশঙ্কা উড়িয়ে দেয় কঠোর যুক্তির উপস্থাপনে এবং তার বক্তব্যই শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় — অর্থাৎ উচ্চশ্রেণির দুষ্কার্য বা আধিপত্যের বিপরীতে মালো সমাজের প্রত্যয়, শুভ মূল্যবোধ, ঐক্যের মাহাত্ম্য এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ইস্পাত-কঠিন দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় মেলে। আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তে জেলেদের একতা ও শক্তিমত্তার প্রমাণ সুনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যমণ্ডিত। যে বাজার বসানোর জন্য এক সময় জমিদার দূত ধরনা দিয়েছে জেলেদের সম্মতির অপেক্ষায়, জমজমাট সে বাজারে যখন জেলেদের মাশুল দিতে বলা হল, মালোদের প্রধান রামপ্রসাদ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল —

> শুন বেপারী, বাবুরে সাফ কথা কইয়া দিও, মালোরা মাছ বেচতে কোনো সময় মাশুল দেয় নাই, দিবেও না, জায়গা দেউক আর নাই দেউক। মালোরা বাজার জমাইতে যেমুন জানে, ভাঙতেও জানে। তারা যেখানে যায়, আ-পথে পথ হয়, আ-বাজারে বাজার হয়। (অদ্বৈত, ২০০০ : ৪৫৩)

বিভাজিত শ্রেণিবদ্ধ সমাজের প্রান্তে অবস্থান করেও তারা স্বমহিমায় বিরাজিত — নিজ গোত্রের সম্মান রক্ষার্থে উচ্চশ্রেণির অবহেলার প্রত্যুত্তর তারা তাদের সংস্পর্শ বর্জন করেই দিতে চায়। উচ্চ শ্রেণির লোকেরা যেমন তাদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করে তেমনি তাদের সঙ্গ-বর্জনের পরামর্শ দেওয়া হয় তামসীর বাপকে দশজনের বৈঠক অর্থাৎ পঞ্চায়েতে এবং পঞ্চায়েতের পরামর্শ আদেশ জ্ঞানেই তামসীর বাপ তৎক্ষণাৎ অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়। যদিও পরবর্তী সময়ে তাদের এ স্বাতন্ত্র্যকে স্পর্ধা জ্ঞানে উচ্চশ্রেণির লোকেরা কৌশলে তামসীর বাপের মাধ্যমেই মালো সমাজের ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি করে তাদের বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবুও প্রান্তিক জীবনের গতানুগতিক যন্ত্রণা ও বঞ্চনার বিপরীতে গৌরবোজ্জ্বল এই স্বাতন্ত্র্যের মহিমা বর্ণিল বিচ্ছুরণে রাঙায় পাঠক মনকে । অদ্বৈত মল্লবর্মণ মার্কসবাদী নন বলেই আমাদের ধারণা[১] — অন্তত এ উপন্যাসে তো তাঁর পরিচয় জীবনবাদী শিল্পীরূপে; অথচ জনগণই যে মূল চালিকাশক্তি — সে প্রত্যয় তিনি উপন্যাসে বাজার বসানোর ঘটনায় ব্যক্ত করেছেন।

২.৩

স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবের আরও অনেকগুলো প্রান্ত তিতাস-তীরবর্তী জনজীবনে রক্ষিত — পদ্মাপারে সেগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার। অদ্বৈত মল্লবর্মণ গভীর মমতায় একটি গোষ্ঠীজীবনের সামগ্রিক পরিচয় বিস্তৃত করেছেন। এ জীবনের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রতিটি উৎসবে পালিত লোকাচার, তাদের কৃষ্টি, তাদের স্বপ্ন এবং তাদের বিলয়কে ফ্রেমবন্দি করেছেন। ঔপন্যাসিকের ভাষায় —

> 'মালোদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। (অদ্বৈত, ২০০০ : ৫৪৫)

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে গোষ্ঠী নয়, ব্যক্তিজীবন প্রধান— সে কারণে এ প্রান্তিক জীবন ঐতিহ্য, কৃষ্টি কিংবা সংস্কৃতির সংসর্গ বঞ্চিত। বস্তুত ঔপন্যাসিক অন্তেবাসী জীবনের এমন পর্যায়কে চিত্রিত করার মানসকে ধারণ করেছেন, যেখানে সভ্যতার কিছুমাত্র স্পর্শ নেই। মালার রূপকথা বলার কাহিনীকে অভিনয় বলে অভিহিত করে ঔপন্যাসিকের শ্লেষাত্মক মন্তব্যে তার প্রমাণ মেলে —

> মালা রূপকথা বলে। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়, তাই এ সময়টা সে যে কত বড় নিখুঁত ভদ্রমহিলা, অসামঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়। লখা ও চণ্ডী উলঙ্গ, চকচকে ভিজা-ভিজা গায়ের চামড়া। ডবরির-শিখাটি ঊর্ধ্বে ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরে চাল পচা শণের, চারিপাশের দেয়ালে চেরা বাঁশের, স্যাঁতস্যাঁতে ঢেউ তোলা মাটির মেঝে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৪৯)

২.৪

নৈতিকতার মানদণ্ডেও উভয় জীবনে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। পদ্মা-তীরবর্তী জীবনে নৈতিকতা কিছুটা শিথিল — সেখানে সিধু দাস কোনো উপায়ে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহকে চুরি বলে মনে করে না, পয়সা চুরিকে কেবল সে চৌর্যবৃত্তি বলে গণ্য করে, প্রতিবেশী কুবেরকে নির্দ্বিধায় সে ঠকায়; কুবের আবার সুযোগ পেলেই হোসেন মিয়ার পয়সা চুরি করে কিন্তু তিন টাকায় দু আনার বেশি চুরি করার সাহস তার নেই। অন্যদিকে তিতাস পারের গোষ্ঠীজীবনে আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রখর — বারোয়ারি পূজায় চাঁদা দিতে অসমর্থ বৃদ্ধ রামকেশব পূজার কয়দিন ঘর থেকে বের হয় না, এমনকি পূজার প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করে না; তিতাসের জলে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলা অসম্ভব মনে হয় তার কাছে। ভিন্ন পাড়ার কেউ যদি মালোপাড়ার বউ-ঝিদের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকায়–তাহলে তাকে গুমখুন করতেও দ্বিধা নেই মালোদের। পদ্মা তীরবর্তী সমাজে বিবাহ-বহির্ভূত যুগী-শীতলের যৌথ জীবনের প্রতি জেলেরা কটাক্ষ করলেও কোনো প্রতিবাদ বা অসন্তোষ জানায় না কেউ। মেজো কর্তার কুবেরের ঘরে আগমনের রটনা বা সন্তানের রং গোরা হওয়ায় তির্যক মন্তব্যের বন্যা বয়ে যায় কিন্তু তাতে তাদের অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

২.৫

প্রান্তিক জীবনে বর্গবিভাজনের মতো ধর্মবিভাজন মুখ্য বা প্রধান নয়। এ বিষয়টি উভয় উপন্যাসে বাস্তবানুগ হয়েই এসেছে— যদিও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা আছে স্বাভাবিকভাবেই। পদ্মাতীরে হিন্দু-মুসলিম জেলেরা একত্রে একই পাড়ায় একই মানের জীবন যাপন করে। সামান্য বেড়ার আবরণ ছাড়া তাদের বাড়ি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। তাদের জীবন-যাপন কিংবা চলনে-বলনে কোনো তফাৎ নেই। হিন্দু জেলে নারীদের মতো মুসলমান নারীরাও সমানতালে বাইরে কাজ করে, পর্দার অনুশাসনে বন্দি হয়ে থাকার বিলাসিতা পোষায় না তাদের। হিন্দু-মুসলমান জেলেদের মিলিত জীবনস্রোতকে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে —

> ধর্ম যতই পৃথক হোক, দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৪২)

তিতাস পারের গোকর্ণঘাট গ্রামে যদিও মুসলমানদের বাস নেই তবে সন্নিকটেই তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে যখন রামপ্রসাদ পঞ্চায়েত শেষে পথ হারিয়ে বাহারুল্লার বাড়িতে হাজির হয়। নিশীথে নিজ বাড়িতে ভিনজাতের ভিনধর্মের রামপ্রসাদকে আবিষ্কার করে গৃহকর্তা বাহারুল্লা বিরক্ত নয় বরং পরম সন্তোষে ভাই বলে সম্বোধন করে, হাত ধরে বারান্দায় তুলে তামাক দিয়ে আপ্যায়িত করেছে — এ বিবরণ তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যের পরিচয় বহন করে। এছাড়া বনমালী ও কাদিরের পারস্পরিক সহমর্মিতা, উদয়তারা ও জামিলার হৃদ্যতা,জারীগান ও কালীপূজায় সকল ধর্মের লোকের মিলিত অংশগ্রহণ তাদের সম্প্রীতিভাবকে উজ্জ্বল করেছে। যদিও লৌকিক জীবনে কিছু ধর্মীয় অনুশাসন তাদের মেনে চলতেই হয়— কাদির মিয়ার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেও বনমালী ও উদয়তারা তাদের অন্নগ্রহণ করতে পারে না বরং নতুন হাড়িতে স্বহস্তে প্রস্তুত আগুনে দুধ গরম করে কোনোরকমে ফলাহার করে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে জাত-পাত বিভাজনের অযৌক্তিকতা প্রকাশে নানা গল্পের অবতারণা এবং হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিশেষ গাঢ়তায় পরিস্ফুট করেছেন। স্পর্শ-বিচারের দৃষ্টান্ত, *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসেও লক্ষণীয়। হোসেন মিয়াকে কুবেরের বাড়িতে যে ঘটিতে জল পান করতে দেয়া হয়, তা তার সামনেই বৃষ্টির পানিতে শুদ্ধ করে নেয়া হয়। নদীর ঘাটে গণেশের বৌ ক্রন্দনরতা আমিনাকে ধরতে ইতস্তত করে কেননা তার কাঁখে পানিভরা কলস। বস্তুত এ ধরনের বিবরণ উপন্যাসদ্বয়কে আরও বেশি বাস্তবানুগ করেছে।

২.৬

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে বুদ্ধির প্রখরতার চেয়ে ঔপন্যাসিকের আবেগের প্রাবল্য উপন্যাসকে বিশেষ মানে উন্নীত করেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ শিল্পীর চোখে তিতাস-তীরবর্তী জনমানসকে দেখেছেন এবং একটি গোষ্ঠীজীবনের সামগ্রিক পরিচয় বিস্তৃত করেছেন। গোকর্ণঘাট গ্রামের মালো সমাজ এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলেও নদী-তীরবর্তী অন্য জনপদের খণ্ডিত জীবনচিত্রও এতে পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক তিতাস পারের জেলে জীবনের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিজয় নদী এবং বৃহৎ মেঘনা নদীর তীরের জেলে জীবনেরও তুলনামূলক ছবি এঁকেছেন — দেখিয়েছেন জেলেজীবনের যে কাঠামো এ

উপন্যাসে তিনি নিয়ে এসেছেন তা অপরিবর্তনীয় নয় বরং স্থানভেদে তার বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায় নদীবহুল এ বাংলায়। জেলেজীবন প্রাধান্য পেলেও নদী-তীরবর্তী ভূমিহীন প্রান্তিক মানুষ, অবস্থাপন্ন মুসলমান চাষী, নৌকা তৈরির কারিগর, বেদে — বিভিন্ন পেশাজীবীকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরম মমতায় কাহিনীতে অঙ্গীভূত করে নদীকেন্দ্রিক জীবনে সমগ্রতা এনেছেন। তিতাস-তীরবর্তী জেলেদের সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের বাস্তবতাকে তিনি সমার্থক করে দেখিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের ভাষায় —

> কাটিলে কাটা যাইবে না, মুছিলে মুছা যাইবে না, এমনি যেন একটা সম্পর্ক আছে জেলেদের সঙ্গে চাষীদের। (অদ্বৈত ২০০০ : ৪৮৫)

বস্তুত জেলে ও চাষী — একই প্রান্তিক জীবনের অধিকারী — তাই পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যে তারা সমমানের জীবনে অভ্যস্ত। একই শ্রেণিগত বৈষম্যের শিকার তারা— উভয়ই বণিক বা বেপারি দ্বারা প্রতারিত, বঞ্চিত। জেলেদের কাছ থেকে যেমন বণিক শ্রেণি অল্প দামে মাছ কিনে বাজারে বেশি দামে বিক্রয় করে— চাষীদের বেলাতেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। চাষ করলেও ভূমির মালিকানা যেমন চাষীদের উপর বর্তায় না, তেমনি তিতাসের জলে মাছ ধরার অধিকার থাকলেও কাগজপত্রের মালিক আগরতলার রাজা। জমিদারকে খাজনা দিয়েই জেলেদের মাছ ধরতে হয়, চাষীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। পদ্মা-তীরবর্তী জেলেরাও একই শোষণের জাল-জটিলতায় বন্দি— পদ্মায় যেদিন ইলিশের প্রাচুর্য সেদিন তারা দাম পায় সবচেয়ে কম; নিজ আঙিনায় নিজ টাকায় ঘর তুলতে হলেও যুক্তকরে নিবেদন করতে হয় জমিদারের কাছে।

৩

পদ্মানদীর মাঝি ও *তিতাস একটি নদীর নাম* উভয় উপন্যাসেরই প্রাণ নদী। পদ্মায় মাছ ধরা, নৌকা চালনা কুবের গণেশের জীবিকা, হোসেন মিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলও প্রমত্ত পদ্মা; তার অফিমের ও আমদানি-রপ্তানির ব্যবসার একমাত্র অবলম্বন নদীপথ। নদী তীরেই কুবের-কপিলার প্রণয়সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং তারা নদীপথ ধরেই ময়নাদ্বীপে যাত্রা করেছে। তিতাস পারের লোকদের কাছেও নদীই প্রধান — নদীকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন আবর্তিত। তিতাসের জলে দাঁড়িয়ে তারা মিথ্যা উচ্চারণ করতে পারে না এবং তিতাস শুকিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদেরও গোষ্ঠীজীবনের সমাপ্তি ঘটে। তবুও পদ্মা ও তিতাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। পর্বত থেকে এর উৎসরণ — সমুদ্রে এর বিলয় তাই সমুদ্র বুকে জেগে ওঠা ময়নাদ্বীপে এ উপন্যাসের সমাপ্তি। অন্যদিকে তিতাস একটি শাখা নদী — মেঘনার শাখা আবার মেঘনাতেই গিয়ে মিলেছে। এ নদীর তীরবর্তী লোকজীবন তাই গণ্ডিবদ্ধ — পরিবর্তনের ছোঁয়াহীন আদিমতাকে ধারণ করে আবহমান বাংলার রূপ পেয়েছে তা। তিতাসকে কেন্দ্র করে যে মালোসমাজ তাতে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব বা ক্রিয়া প্রধান নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই প্রাণ এবং মালোসমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির যে দিন পরাজয় ঘটেছে, তারা যখন বহিঃসংস্কৃতি বা সস্তা জনপ্রিয় সংগীতকে গ্রহণ করেছে সেই দিন থেকেই তাদের যৌথ-জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে — তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপরদিকে পদ্মা নদীকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রাধান্য পেয়েছে। পদ্মা বড় নদী এবং সেখানে ইলিশ ধরা হয়। তিতাস মেঘনার উপনদী। এখানে

ইলিশের মত মহার্ঘ্য মৎস্য পাওয়া যায় না। ইলিশের ভোক্তা আর তিতাসের জল থেকে পাওয়া মাছের ভোক্তার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন মাপকাঠিতে মাপতে হয়। তিতাসে কোনো বাণিজ্যের নৌকা জাহাজ নেই। অপর পক্ষে পদ্মা দূর অতীত কাল থেকে বাণিজ্যিক অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তিতাসে জীবন মূলত আবহমানকালের এবং উপন্যাসের শেষে সমকাল সহসা উদগ্র হয়ে উঠেছে। অপর পক্ষে পদ্মাপারের জীবন হোসেন মিয়ার মতো লোলুপ ক্ষমতাধর মানুষের শ্যেনদৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ। স্বভাবতই সমকালের ইঙ্গিত *পদ্মা নদীর মাঝি*তে প্রবলতর। অফিমের ব্যবসা, হাসপাতালে অপারেশন ইত্যাদি কাহিনীকে সমকাল লগ্ন করেছে। এখানে মানুষের লড়াইটা জটিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন বিশ্লেষণের মধ্যে একটা চৌকস প্রতিবেদক কাজ করে যাচ্ছে। মানিকের জীবনোলব্ধি ও জীবনাদর্শ পদ্মায় যেমন গাঢ়, তিতাসের অদ্বৈত সেই একই দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন নি। মানিক সমাজ পর্যবেক্ষণে দ্বান্দ্বিক সূত্রে নির্ভরশীল; অপর পক্ষে অদ্বৈত সরল রৈখিক; জীবনের বিবর্তন নয়, একটি গোষ্ঠীজীবনের করুণ মৃত্যুর অর্কেস্ট্রা শুনিয়েছেন তিনি। যদিও তিতাসের শুকিয়ে যাওয়ার সংকট এবং চরে কৃষির সূত্রপাত — এই পালাবদলে জেলেরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং নতুন সময় আছড়ে পড়েছে উপন্যাসের শেষাংশে তবু আদিম ও লোকজ বলয়ের অনুপুঙ্খ বৃত্তান্তই তিতাসে ব্যস্তভাবে পাঠ্য। প্রান্তিক জীবন নদী কিংবা ভূমির পরিবর্তনে খাপ খাওয়াতে পারে না; এই সত্য তিতাসের উপসংহারে উপস্থাপিত হয়েছে। অপরপক্ষে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে শোষণযন্ত্রের সক্রিয়তায় প্রান্তিক মানুষের নিরন্তর বলি হওয়ার সত্য বিঘোষিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উভয় উপন্যাসেই প্রান্তিক জীবন আলোকোজ্জ্বল মহিমায় বিকীর্ণ।

টীকা

১. *চতুর্থ দুনিয়া*-অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যায় (১৯৯৪) প্রকাশিত সাগরময় ঘোষের সাক্ষাৎকার 'ভেবেছিলাম একটি মৌলিক উপন্যাস লেখাব —হল না'— এ থেকে ধারণার পক্ষে প্রমাণ দেয়া যায়। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, অদ্বৈত কি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি ঝুঁকেছিলেন? সাগর বাবু স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন—না, বরং তিনি কমিউনিস্টদের তৎকালীন ভূমিকা দেখতেন সমালোচনার চোখে। সাক্ষাৎকারটি 'চতুর্থ দুনিয়া'-অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা ও 'ভাসমান'-অদ্বৈত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলনের নির্বাচিত অংশের পুনঃমুদ্রণ (অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি সম্পাদিত, ২৭ শে আগস্ট ১৯৯৯, *তিতাস একটি নদীর নাম ও অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, ঢাকা) থেকে গৃহীত হয়েছে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অদ্বৈত মল্লবর্মণ *রচনাসমগ্র*, ২০০০। অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গুণময় মান্না, ১৩৯৫। *'জীবনে মানিক, সাহিত্যেও মানিক'*, 'জলার্ক', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, কলকাতা।

সরোজমোহন মিত্র, ১৩৮৯। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, ২০০৮। 'উত্তরাধিকার', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ১৯৯৫। হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।